Vol. 31 | No. 3 | 198

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আধুনিক বিচারে বিষাদ-সিন্ধু

Volume	31
Issue	3
Year	198
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জাহাঙ্গীর চৌধুরী
Published online	June 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i3.2
Pages	22-56
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আধুনিক বিচারে বিষাদ-সিন্ধু

জাহাঙ্গীর চৌধুরী

'বিষাদ-সিন্ধু' মীর মশাররফ হোসেনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি কোন্‌টি এ প্রশ্নে সমালোচক মহলে মতভেদ[1] থাকলেও তাঁর খ্যাতি যে, প্রধানতঃ 'বিষাদ-সিন্ধু'র জন্যেই, এ কথা সর্বজন-স্বীকৃত। বস্তুতঃ মীর সাহেব ছোট বড় প্রায় ৪২ খানা গ্রন্থের রচনাকার হলেও 'বিষাদ-সিন্ধু'র জন্যেই তিনি বাঙালী পাঠক-সমাজে পরিচিত ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বহুকাল পর্যন্ত একমাত্র 'বিষাদ-সিন্ধু'ই মশাররফ হোসেনের একক পরিচিত গ্রন্থ ছিলো। বাঙালী সমাজে 'বিষাদ-সিন্ধু' বলতে 'মীর মশাররফ হোসেন' এবং 'মীর মশাররফ হোসেন' বলতে লোকে 'বিষাদ-সিন্ধু' বুঝত। এদেশের মুসলিম পাঠক-সমাজে, জনপ্রিয়তার বিচারে দু'টি পুস্তক তুলনা রহিত—'আনোয়ারা'[2] এবং 'বিষাদ-সিন্ধু'।[3] 'বিষাদ-সিন্ধু'ই মীর মশাররফ হোসেনকে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী করেছে।

'বিষাদ-সিন্ধু' মশাররফ হোসেনের পরিণত বয়সের রচনা। তাঁর ছত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এটি রচিত। তাঁর জীবনের মূল্যবান সময়ের শ্রেষ্ঠ ফসল এই 'বিষাদ-সিন্ধু'। এটি মোট তিন পর্বে, তিন দফায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৮৫ (মহরম পর্ব্ব), ১৮৮৭ (উদ্ধার পর্ব্ব) ও ১৮৯১ (এজিদ-বধ পর্ব্ব)[4] । 'মহরম পর্ব্বে' উপক্রমণিকাসহ ২৭, 'উদ্ধার পর্ব্বে' ৩০ এবং 'এজিদ-বধ পর্ব্বে' মোট ৫টি অধ্যায় রয়েছে। লেখক অধ্যায়গুলোর নাম দিয়েছেন 'প্রবাহ'। ১৮৯১ সালে তিনখণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ সাত বছর ধরে রচিত ও প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি মশাররফ হোসেনের অন্যান্য লেখা থেকে স্বতন্ত্র। ইতঃপূর্বে মশাররফ হোসেন একটি উপন্যাস, দুটি নাটক, একটি প্রহসন ও একটি ক্ষুদ্র কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর এসব লেখার কোন কোনটি সমকালীন বিদগ্ধ সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও বৃহত্তর সমাজে সমাদৃত হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই। 'বিষাদ-সিন্ধু' সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী গ্রন্থ—কেননা এ-রচনা সমাজের সর্বস্তরে কেবল

অভিনন্দিত হয়নি—তৎসহ লেখক সম্পর্কে সকল পাঠকের মনোযোগ উদ্বুদ্ধ করেছে।

'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম সংস্করণটি লেখক উৎসর্গ করেছিলেন দেলদুয়ারের জমিদার 'শ্রীমতি করিমননেসা খাতুন সমীপে।'[৫] 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম থেকে অষ্টম সংস্করণের মধ্যে মশাররফ হোসেন গ্রন্থের অনেক পরিবর্তন ও পরি-বর্ধন করেন।[৬] এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (মহরম পর্ব্ব)—এর ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেন যে, রংপুরের পায়রাবন্দের হাফেজ খলিলুর রহমান আবুযায়গম সাবের সাহেব মূল গ্রন্থের অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু 'বিষাদ-সিন্ধু'র পরবর্তী সংস্করণগুলোতে তাঁর নাম আর কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

'বিষাদ-সিন্ধু'র মহরম পর্বের ভূমিকায় মশাররফ হোসেন তাঁর ভাষা সম্পর্কে বলেন, "শাস্ত্রানুসারে, পাপ ভয়েও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু'র মধ্যে কতকগুলি 'জাতীয় শব্দ' ব্যবহার করিতে হইল। বিজ্ঞ মণ্ডলী ইহাতে যদি কোন প্রকার দোষ বিবেচনা করেন, সদয়ভাবে মার্জ্জনা করিবেন।" স্পষ্টতই 'জাতীয় শব্দ' বলতে তিনি আরবী-ফারসী শব্দের কথা বলেছেন। এবং এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে বলে নিদারুণ সংকোচ অনুভব করেছেন। কারণ সে সময় বাংলা-গদ্যে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার নতুন-শিক্ষিত হিন্দু-সমাজে নিন্দিত হতো। এই শিক্ষিত হিন্দু-সমাজকে কেন্দ্র করে তখন গড়ে উঠেছিল নতুন একটা গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর প্রশংসা ও পোষকতা না পেলে কোন সাহিত্যিক-ই তাঁর সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারতেন না। এ গোষ্ঠীর অনেকেই বাংলা গদ্যে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারকে 'অসাহিত্যিক কাজ' বলে মনে করতেন, এবং যে-সব রচনায় এ ধরনের শব্দ ব্যবহার হতো, তাকে 'গর্হিত সাহিত্য' বলে নিন্দে করতেন।[৭] তাই দেখা যায়, মশাররফ হোসেন প্রয়োজনের খাতিরে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার করলেও, সমগ্র সাহিত্য-পরিমণ্ডল সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই শুরুতেই তিনি মার্জনা ভিক্ষে করে নিয়েছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্য-চর্চার জন্য মুসলমান লেখকদের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দিয়েছিলেন শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ। 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশিত হলে হিন্দু-সমাজ এর উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। পক্ষান্তরে লেখক স্ব-সমাজের লোকদের পক্ষ থেকে পেয়েছিলেন শুধু গঞ্জনা।[৮]

'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম খণ্ড (মহরম পর্ব্ব) প্রকাশিত হবার পর বেশ কয়েকটি পত্রিকায় এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'বিষাদ-সিন্ধু' এবং মশাররফ হোসেনকে সে-সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের জন্যে আমরা উক্ত সমালোচনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখবো। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' মন্তব্য করে, "মুসলমানদিগের গ্রন্থ এ রূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।"[৯] 'সুলভ সমাচার' লেখে, "এ দেশের মুসলমানেরা কেহ যে এ রূপ বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে জানেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না।"[১০] 'চারুবার্ত্তা' মন্তব্য করে—

> হিন্দু মুসলমানে একতা সম্মিলন না হইলে যে এদেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে না, অনেক চিন্তাশীল লোক একথা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভাষার একতাই জাতীয় বন্ধনের মূল। ...বাঙ্গালার লোক-সংখ্যায় দেখা গিয়াছে এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় তুল্য। এই যে তিন কোটি মুসলমান, বাঙ্গালা দেশই ইহাদের মাতৃভূমি, বাঙ্গালা ভাষাই ইহাদের মাতৃভাষা। কিন্তু মুসলমানেরা এ কথা স্বীকার করেনা। ইহারা যদিও মাতৃভূমি বলিয়া অন্য কোন দেশের উল্লেখ করিতে পারেনা কিন্তু পারসী-আরবীই তাঁহাদের মাতৃভাষা মনে করেন। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানে কদর্য্য বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলিতে বা বাংলা চর্চ্চা করিতে একান্ত বিরোধী। ...কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষিত মুসলমান বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মীর মশাররফ হোসেন তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ...ইনি যে রূপ বিশুদ্ধ ও সুমধুর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন অনেক শিক্ষিত হিন্দু তেমনি লিখিতে পারেন না।[১১]

'ভারতী' মন্তব্য করে, "ইতপূর্ব্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না।"[১২] উপর্যুক্ত সমালোচনা-গুলো থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের আগমন ও সকলের বিস্ময় প্রকাশ। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সংকটের মৌলিক দুর্বলতাটুকুও তাঁরা অনুধাবন করতে পেরে-ছিলেন। সমালোচনায় শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের আন্তরিক প্রশংসাই শুধু ব্যক্ত হয়নি, তাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দুটি বৃহৎ সমাজের 'ঐক্য সেতু' বলেই মনে করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই মুসলমানের ধর্ম,

ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁরা অগ্রসরমান লেখক মীর মশাররফ হোসেনকে সাহিত্য-চর্চার জন্যে উৎসাহ দেন। শুধু তাই নয়, অন্য মুসলমানদেরও এ বিষয়ে এগিয়ে আসবার জন্যে তাঁরা আহ্বান জানান।

কায়কোবাদ-এর 'মহরম-শরিফ' কাব্যের ভূমিকায় আমরা বিষাদ-সিন্ধুর একটি সমালোচনার উল্লেখ পাই :

> অন্যান্য নগণ্য সমালোচকের কথা ছাড়িয়া দিলাম ; কিন্তু জানিনা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর এই 'বিষাদ-সিন্ধু'র অতল গর্ভে ডুব দিয়া কোন রত্ন পাইয়া এত প্রশংসা করিয়াছে। আমরা বড় দুর্ভাগা, কেননা 'বিষাদ-সিন্ধুতে' অনেকবার ডুব দিয়াছি, রত্নও পাইলামনা, রত্নের পরিবর্তে কতগুলি কাঁচ পাইলাম। তবে আমরা রায় বাহাদুরের মত ডুবুরী নহি, এই যা আক্ষেপ।[১৩]

সত্যিই কায়কোবাদ দীনেশচন্দ্র সেনের মত ডুবুরী নন। এ কারণেই তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু'তে 'রত্নের' বদলে পেয়েছেন 'কাঁচ'। ফলে এর প্রশংসা তিনি করতে পারেননি। কায়কোবাদ তাঁর 'মহরম শরিফে'র ভূমিকায় 'বিষাদ-সিন্ধু'র যে সমালোচনা করেন তা প্রকৃতই নিন্দাবাচক। সমালোচনাটি মশাররফ হোসেনের মৃত্যুর পর রচিত হলেও কায়কোবাদ মশাররফ হোসেনের সমকালীন সাহিত্যিক, এ ছাড়া মশাররফ হোসেনের হাতে কারবালা কাহিনীর ধর্মাদর্শের বিপর্যয় লক্ষ্য করে দুঃখিত হয়ে, তিনি তাঁর 'মহরম শরিফ' কাব্য রচনা করেন। এ কারণে কায়কোবাদের মন্তব্যের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তিনি মনে করেন—মীর মশাররফ হোসেন সাহেব কল্পনা রাজ্যের কতগুলি অবান্তর কথা লিখিয়া, ঘটনা উপন্যাস আকারে সাজাইয়া ইসলামের হৃদয়-পঞ্জরে তীব্র শেলাঘাত করিয়াছিলেন।[১৪] মীর মশাররফ হোসেনের হাতে কারবালা কাহিনীর এ বিপর্যয় লক্ষ্য করে কায়কোবাদ দুঃখ প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয় একজন সহশিল্পীর এই রূপ অপরাধ (?) অপনোদনের জন্যে এবং ঐতিহাসিক কারবালা কাহিনীর ধর্মীয় বিশুদ্ধতা রক্ষার মানসে তিনি রচনা করেন 'মহরম শরীফ'।

কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা এবং 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনী পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, কারবালার ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস থেকে কাল্পনিক বিবৃতিই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। "মকতুল হোসেন,

'জঙ্গনামা' ও 'শহীদে কারবালা' প্রভৃতি মিশ্রভাষারীতির কাব্যে এ ঐতিহাসিক ঘটনার যে কাল্পনিক বিবৃতি 'বিষাদ-সিন্ধু'তে আমরা তারই পরিচয় পাই।"[১৫] হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মাত্র ; এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু'তে এ দ্বন্দ্বের মূল কারণ— এজিদের অনিবার্য রূপতৃষ্ণা।

কারবালা কাহিনীর উপ-কাঠামোর ভেতরে, এই কাব্যের প্রাণমূলে পুথি সাহিত্যের কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে মশাররফ হোসেন যে প্রাণের সঞ্চার করতে পেরেছেন, তাতে মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু প্রভাবও তাঁর উপর ক্রিয়া করেছে বলে মনে হয়। এ-প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন—

> মধুসূদন ও বঙ্কিমের যুগে মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ নানাদিক দিয়ে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। তাঁর বাক্যের গঠন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুযায়ী— অবশ্য কিছু বেশী বাক-বাহুল্য তাতে আছে ; তাঁর মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মন্ত্রণায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে এবং স্বাধীনতার জন্য দরদেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তাঁর নিবিড়তম যোগ মধুসূদনের সঙ্গেই।[১৬]

মাইকেল যেমন হিন্দু পুরাণের বহু পরিচিত ঘটনাকে তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছেন, তেমনি মশাররফ হোসেনও মুসলিম জগতের অতি পরিচিত একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনা করেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র 'রাবণ' চরিত্রের সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু'র 'এজিদ' চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যে প্রেম মাইকেলের কাব্যে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে—সে প্রেমই, 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রত্যক্ষ প্রেরণা। ধনে-জনে, শৌর্যে-বীর্যে রাবণের মত এজিদও অদ্বিতীয়। তবুও রাবণের মত এজিদকেও পরাভব স্বীকার করতে হলো। উভয় লেখকই তথাকথিত দুটো ঘৃণ্য-চরিত্রে মানবিক অনুভূতি আরোপ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। মশাররফ হোসেনের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পড়েছে মূলতঃ ভাষার ক্ষেত্রে। তবে মশাররফ হোসেনের ভাষা-বিচারে এ কথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, তিনি বঙ্কিমের কাছে ঋণী। ঋণী হয়তো যথার্থ, কিন্তু মীরের কুশলতাও লক্ষণীয়।[১৭]

জনপ্রিয়তার কারণ

'রামায়ণ', 'মহাভারতে'র পুরাণ কাহিনীর মতো মুসলমান-সমাজে মোহরম তথা কারবালা কাহিনী বহুল প্রচারিত। 'রামায়ণ', 'মহাভারত'কে কেন্দ্র করে প্রচুর বই লেখা হয়েছে, প্রতি-তুলনায় মোহরম কাহিনী নিয়ে এত বই রচিত না হলেও বহু মুসলমান কবি-সাহিত্যিক এর থেকে প্রেরণা নিয়ে অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন। মোহাম্মদ খাঁয়ের 'মকতুল হোসেন', মোহাম্মদ এয়াকুবের 'জঙ্গনামা', মুন্সী জনাব আলীর 'শহীদে কারবালা', মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু', কায়কোবাদের 'মহরম শরিফ,' ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'মহাশিক্ষা-কাব্য' প্রভৃতি এবং এ-কালে কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ প্রমুখের রচনায় মোহরমের কাহিনী নতুন নতুন ইঙ্গিতে এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে—যার মধ্যে মুসলমান সমাজের নাড়ীর যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। তাই মুসলমানের ঘরে-ঘরে 'জাতীয় মহাকাব্য' রূপে মোহরমের কাহিনী নিয়ে একটা না একটা বই পাওয়া যাবেই। এগুলোর মধ্যে সংখ্যা ও গুণগত বিচার এবং জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' অদ্বিতীয়।[১৮] বিষাদ-সিন্ধুর এ জন-সমাদরের বিভিন্নমুখী কারণ বিদ্যমান—

ক. মশাররফ হোসেনের পূর্বে এদেশীয় মুসলমানদের রচনা 'মুসলমানী শব্দ' দ্বারা বড় বেশী জর্জরিত ছিল। বাংলা অক্ষরে তাঁরা বাংলা লিখতেন বটে, কিন্তু তাতে আরবী-ফারসী শব্দের এত বাহুল্য ছিল যে, তাকে বাংলা ভাষা বলতে কষ্ট হতো। এ কারণে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, "বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। ...বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচচ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবেনা। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।"[১৯] ভাষার ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকদের এই সংস্কারের বিরুদ্ধে মশাররফ হোসেন প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মুসলমানী বিষয় নিয়ে রচিত হলেও 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তিনি 'বিশুদ্ধ বাংলার'ই চর্চা করেন। ভাষার ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কারণে শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও মশাররফ-এর ভাষার প্রশংসা করেন— তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' শিক্ষিত-সমাজে দারুণভাবে সমাদৃত হয়।

খ. মুসলিম রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায় দেশের মাটির উপর দাঁড়িয়েও এদেশকে গ্রহণ করেননি, এক প্রকার উন্নাসিক মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় দিগ্বিদিক যখন উদ্ভাসিত, তখনও মুসলমান সমাজ উট পাখির মতো আরবী-ফারসীর মরুময় বালুতে মাথা গুঁজে নিষ্ফল নিকৃতি খুঁজেছেন। 'ওয়াহাবী আন্দোলনে'র ব্যর্থতায়, বাস্তবের কড়া আলোকে মুসলমানের বাদশাহী মেজাজ ও রঙ্গিন স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার পরেই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাকে গ্রহণ করা ছাড়া আর বেঁচে থাকার পথ রইলোনা—তাঁদের ভুল রূঢ়ভাবেই ভাঙলো। ফলে, কালের ধর্মে পুরোনো রুচি যখন শেষ হয়ে গেল তখন পুথি-পত্রের পাতা গুটাতে হলো। রুচির পরিবর্তনে সাহিত্য-রীতিরও পরিবর্তন ঘটে গেল। উদীয়মান শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনের ক্ষিধে পুথি, মর্সিয়া দিয়ে মিটলোনা, কোথায় যেন একটা কিসের অভাব থেকে যাচ্ছিলো। বলা চলে, মশাররফ হোসেনের আবির্ভাবে এই অভাব সর্বপ্রথম পূর্ণ হয়। তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিপুলভাবে তা আলোচিত হয়—প্রশংসা লাভ করে।

গ. বাঙালী মুসলমানের নিকট 'বিষাদ-সিন্ধু'র জনপ্রিয়তার একটি বিশেষ কারণ—গ্রন্থটির কাহিনীগত দিক। হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হাসান-হোসেনের বিষাদময় মৃত্যুকাহিনী স্বভাবতই মুসলমানদের অন্তরকে গভীরভাবে শোকার্ত করে তোলে। এ কারণেই বাংলাদেশে এক সময়ে জঙ্গনামা শ্রেণীর কাব্য শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কেবল মধ্যযুগেই নয়, ঊনবিংশ-বিংশ শতক পর্যন্ত কারবালা কাহিনীর করুণ ধারা সিঞ্চনে এদেশের মানুষের মন অভিসিঞ্চিত হয়েছে। ঘটনাটির হৃদয়-বিদারী শোকাবহ পরিণতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত হয়েছে মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারবোধ—দুই ধারার এই মিলিত প্রবাহ সহানুভূতিশীল পাঠকের অন্তরকে কী বিপুল পরিমাণে আবেগমথিত করতে সক্ষম, সার্থক শিল্পীর রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু'ই তার প্রমাণ। ''বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত হইয়াছিল, 'বিষাদ-সিন্ধু' তেমনই আজ পর্য্যন্তও 'জাতীয় মহাকাব্য'রূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়; বাঙলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্য কাব্যখানির সমান আদর।''[২০]

ঘ. মুসলমানদের কোন উল্লেখযোগ্য 'মিথলজি' নেই। মিথলজির আশ্রয়ে হিন্দু ধর্মে দেব-দেবীর মহিমা প্রচারিত হয়। নিরক্ষর, অল্প শিক্ষিত জন-সাধারণ পালা-পার্বণে রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালি কথকতার মাধ্যমে সাহিত্য-রস আস্বাদনের সঙ্গে ধর্মপালনের তৃপ্তিও সহজে আদায় করতে পারে। প্রতি-তুলনায় মুসলমানদের নিরাকার চেতনাবাহী ধর্ম-কাঠামো অন্ততঃ নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত এবং নতুন ধর্মান্তরিতদের জন্যে সূক্ষ্ম বোধ হবার কথা। শিক্ষা সংস্কৃতিহীন নগরবাসী মুসলমান সাধারণের চাহিদা অনু-সারে রসালো কাহিনী পরিবেশন করতে গিয়ে মিশ্রভাষারীতির পুথিকার নানা অলৌকিক, অনৈতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা সৃজন করেছেন। তাঁরা হিন্দু দেব-দেবীর সমকক্ষ বীর সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সে বীর তাঁদের নিজস্ব ধর্মেরই—যে বীর হবেন তাঁদের আদর্শ সামাজিক বীরও। এই সামাজিক বীর নায়কদের মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারও ছিল এ শ্রেণীর পুথি রচনার অন্যতম মৌল উদ্দেশ্য। হীনমন্যতাবোধ দূর করার প্রতিক্রিয়াজাত প্রয়াসে দেব-দেবীর মত অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন বীর নায়ক-নায়িকা এঁরা এনেছেন ফারসী রচনা অথবা উর্দু-হিন্দীর মাধ্যমে বাংলায় ভাষান্তরিত কাহিনীগুলো থেকে। এই রচনাগুলোতে ইতিহাসের বিকৃতি যেমন ঘটেছে, তেমনি এদের মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে ঐ সব নায়ক সম্পর্কে দেশজ ধারণার। ফলে নবদীক্ষিত মুসলমান—যাঁদের অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু থেকে আগত, তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে পুলকিত হয়। এই কারণেই হাজার হাজার, লাখ লাখ, অশিক্ষিত মানুষ এই গ্রন্থ পড়ে উত্তেজিত হয়েছে, বিচলিত হয়েছে, গভীর শোকে অশ্রুপাত করেছে, নিদারুণ আক্ষেপে নিষ্পিষ্ট হয়েছে তাদের হৃদয়। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে একাধারে সাহিত্যরস, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য (নতুন সাংস্কৃতিক খোরাক) ও ধর্মীয় পুণ্যলাভের তৃপ্তি এ গ্রন্থকে সাধারণ মুসলিম-সমাজে করে তুলেছে অশেষ জনপ্রিয়।

ঙ. 'বিষাদ-সিন্ধু'র রচনারীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয়, প্রথম সুযোগেই অবিলম্বে পাঠক-চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র স্থাপনে লেখক দারুণভাবে আগ্রহী। এই আত্মীয়তা স্থাপনের ফলে অতি সহজেই স্বয়ং পাঠক সমগ্র কাহিনীর অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। অতঃপর ঘটনা প্রবাহের বিচিত্র উত্থান-পতন, চরিত্রসমূহের দ্বন্দ্ব, সংকট, জয়-পরাজয়ের সঙ্গে পাঠকের চিত্ত সমভাবেই আন্দোলিত হতে থাকে। আমরা তখন আর

'বিষাদ-সিন্ধু'র নিরপেক্ষ পাঠক নই, এর ঘটনাসমূহের উৎসুক, আগ্রহী দ্রষ্টামাত্র নই—এই উপন্যাস যেন আমাদেরই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কাহিনী, আর এই জীবন-কাহিনী আমরা নিজেরাই রচনা করে চলেছি। 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন এখানে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—

> তাঁহার (মীর মশাররফ হোসেনের) সাহিত্য-প্রতিভা এমনই উচ্চ শ্রেণীর ছিল যে, সুদূর অতীতের কারবালা-প্রান্তরের ট্র্যাজেডিকে তিনি সমগ্র বাংলা ভাষা-ভাষীর ট্র্যাজেডি করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।[২১]

সাহিত্যিক পরিচয়

কারবালার ধর্মীয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত বলে সাধারণ দৃষ্টিতে বিষাদ-সিন্ধুকে একটি 'ধর্মীয় গ্রন্থ' বলে মনে করা যেতে পারে। গ্রাম-বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান এই গ্রন্থটিকে ধর্মীয় অর্থেই মর্যাদা দিয়ে থাকেন। উপন্যাস পাঠ যাদের মনকে পাপবোধে আচ্ছন্ন করে এই গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁরা পুণ্যের স্পর্শ পান! ধর্মীয় চেতনা ও বোধে তাঁদের হৃদয়-মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। আবার কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে রচিত বলে অনেকে এই গ্রন্থটিকে 'ঐতিহাসিক গ্রন্থ' হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। এখন আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবো 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন্ শ্রেণীর রচনার পর্যায়ভুক্ত।

অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মুসলমান 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠে এক প্রকার ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতির পরিতৃপ্তি লাভ করলেও—'কোরআন শরিফ' বা 'হাদীস' যে-অর্থে ধর্মীয় গ্রন্থ তার কোন চিহ্ন এতে নেই। প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি নামের উচ্চারণ এবং কিছু ঘটনার পারম্পর্য ছাড়া 'বিষাদ-সিন্ধু'তে ধর্মের আর তেমন কোন প্রমাণ ও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ-গ্রন্থ পাঠে মোটেই এই প্রতীতি জন্মায়না যে, মশাররফ হোসেন ধর্ম প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। এখানে তিনি ইসলাম ধর্মের মর্ম ব্যাখ্যা করেন নি—রসুলের দৌহিত্র ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় এবং আবু হানিফা এই গ্রন্থে নির্জীব পুতুল মাত্র। তাঁদের মাধ্যমেও লেখক ধর্ম-মহিমা কীর্তন করেননি। বরং

ধর্মদ্রোহী পাপাচারী এজিদের হৃদয়-বেদনা শিল্পীর সংবেদনশীল অন্তরে বড় মধুর ও করুণ হয়ে বেজে উঠেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে এজিদের জন্যেই লেখকের যতসব আয়োজন। শুধু তাই নয়, গ্রন্থের মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার, তাও তিনি স্বেচ্ছায় করেননি। "শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ়বন্ধনে বাধ্য হয়েই"[২২] তা করেছেন। সুতরাং 'বিষাদ-সিন্ধু'কে কোন অর্থেই 'ধর্মীয় গ্রন্থের' মর্যাদা দেওয়া যায়না। ধর্মীয় গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবেও গ্রহণযোগ্য নয়। ঐতিহাসিক কিছু ঘটনার উল্লেখ এতে আছে। কিন্তু হোসেনের ছিন্ন মস্তক থেকে প্রবাহিত শোণিত বিন্দুর ধারায় এজিদের পরিণাম আরবী হরফে লিখিত হওয়া, এবং সেই খণ্ডিত শির উর্ধ্বাকাশ থেকে পতিত, স্বর্গীয় জ্যোতির আকর্ষণে আসমানে ওঠে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা অবাস্তব। এখানে মশাররফ হোসেন অলৌকিকতার সীমাও অতিক্রম করে গেছেন। কারবালার বিষাদময় ইতিহাস তার কতদূর জানা ছিলো আমরা জানিনা তবে লিখতে বসে তিনি ইতিহাসের যথার্থ অনুসরণ করেননি। কারবালার ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস থেকে কাল্পনিক বিবৃতিই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বেশী।[২৩] সুতরাং 'ঐতিহাসিক গ্রন্থ' হিসেবেও 'বিষাদ-সিন্ধু' বিচার্য নয়।

অনেকের মতে 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস। এখন প্রশ্ন আসলে এটি উপনাস কিনা ? আর উপন্যাস হয়ে থাকলে তা কোন্ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ? এ-গ্রন্থের অতি প্রাকৃত অংশগুলোর কথা, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, স্মরণে রাখলে একে উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কেননা এই সব অতি-প্রাকৃত ঘটনা কোন উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারেনা। তবে "বিষাদ-সিন্ধু'তে একটি কাহিনী রয়েছে এবং সে কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহু উপ-কাহিনী গড়ে উঠেছে,—যা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।"[২৪] সাধারণ ভাবে পাঠ করলে মনে হবে এই গ্রন্থটিতে ধর্মই প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানব প্রীতি এবং শিল্পবোধই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বেশী।[২৫] এই মানব প্রীতি ও শিল্পবোধ 'বিষাদ-সিন্ধু'র অন্যান্য ত্রুটিকে ছাপিয়ে একে একটি উপন্যাসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস হয়ে থাকলে, এবারে বিচার্য এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস কিনা ? এ-গ্রন্থ রচনায় মীর সাহেব ইতিহাস অনুসরণ যতটা না করেছেন, তার চেয়ে বেশী অনুসরণ করেছেন নানা কিংবদন্তীপূর্ণ উপা-খ্যানমূলক পুথি সাহিত্যকে। বিষাদ-সিন্ধুর প্রধান চরিত্রগুলো ইতিহাস

থেকেই সংকলিত। অপ্রধান চরিত্রগুলোর অধিকাংশই পুথি সাহিত্য থেকে সংগৃহীত এবং অনেকগুলো লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি। এজিদের সঙ্গে হোসেনের ঐতিহাসিক কারণে যেখানে মতান্তর, তা সম্পূর্ণটাই রাজনৈতিক। কিন্তু মশাররফ হোসেন দেখিয়েছেন কারবালার যুদ্ধের মূল উৎস প্রেম।[২৬] এ-দিক থেকে বিচার করলে 'বিষাদ-সিন্ধু'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা যায়না।

'বিষাদ-সিন্ধু'র পটভূমি নির্বাচনে মীরের সচেতন শিল্পী-মানস যথেষ্ট মহত্ত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। যে বিশাল পটভূমিতে রচিত হলে সাহিত্য-সমুদ্রে মহাসাগরের কল্লোল-ধ্বনি শুনা যায়, বিষাদ-সিন্ধুতে তাই পাওয়া যায়। 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ছাড়া একমাত্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ই সম্ভবতঃ এই ধরনের বৃহত্তর পটভূমি প্রত্যক্ষ করা যায়। বিষাদ-সিন্ধুতে রয়েছে মহাকাব্যের বিশাল পটভূমিকা। এখানকার সংঘর্ষ ব্যক্তিগত সংঘর্ষের কাহিনী নয়—এ হচেছ্ ক্ষমতার প্রশ্নে দুই নৃপতির মধ্যে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত ছিল বহুলোকের জীবন ও ভাগ্য। এই গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক পাত্র-পাত্রী আছে, এর মধ্যে রয়েছে অনেক কাহিনী—শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত। হিংসা বিদ্বেষ জর্জরিত মানুষের কামনা-বাসনা, প্রভুত্বের জন্যে ষড়যন্ত্র, নিষ্ঠুরতা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এইসব ঘটেছিল একটি নারীকে কেন্দ্র করে। যে প্রেম মাইকেলের কাব্যে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সে প্রেমই 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রত্যক্ষ প্রেরণা। ঠিক এমন ঘটনা গ্রীক-সাহিত্যের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যেও ঘটেছিল—যার কেন্দ্র-বিন্দু একটি নারী। বিশাল পটভূমিকা, আয়তন ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে 'বিষাদ-সিন্ধু'কে একটি মহাকাব্যও বলা যেতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন 'বিষাদ-সিন্ধু' কি ধরনের গ্রন্থ ? 'বিষাদ-সিন্ধু'র এই জটিল শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

> 'বিষাদ-সিন্ধু' খাঁটি ঐতিহাসিক নয়, জীবন-চরিতও নয়, তেমনি আঁটঘাট বাঁধা বিধিবদ্ধ(Organic Plot)এর উপন্যাস নয়। এ ইতিহাস, উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মী রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগ মাখানো এক সংকর সৃষ্টি।[২৭]

যদিও অন্যান্য লক্ষণের মিশ্রণ এতে আছে, তবু সামগ্রিক বিচারে 'বিষাদ-সিন্ধু'কে উপন্যাস হিসেবে মূল্যায়ন করাই যথার্থ হবে বলে মনে হয়।

চরিত্র-চিত্রণ

সাধারণ মানুষের কাছে 'বিষাদ-সিন্ধু' জনপ্রিয় হবার যে কারণই থাকুক না কেন, বিষাদ-সিন্ধুতে শিল্পী মশাররফ হোসেনের কৃতিত্বের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। "মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবন বিমুখ আচ্ছন্নতাকে অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয়-পরবশ মানব-মানবীর হর্ষলোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সেটাই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই জন্যই বিষাদ-সিন্ধুর প্রধান চরিত্রসমূহ কিস্‌সা কাহিনীর ক্রোড়োদ্ভূত হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত মৃত্তিকা-সংলগ্ন, প্রিয় পরিজন-বেষ্টিত, শত্রুমিত্র পরিবৃত, সজীব নরনারী।"[২৮]

বিষাদ-সিন্ধু চরিত্র-প্রধান উপন্যাস। চরিত্রগুলোকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। একদিকে রয়েছে হযরত মুহম্মদ(সঃ)-এর বংশধরগণ, অন্যদিকে অপরাপর চরিত্রসমূহ। হযরত মুহম্মদের বংশধর-গণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁরা সকলেই অত্যন্ত সৎ এবং মহৎ। তাঁরা নিয়তি ও বিধাতাকে একান্তভাবে বিশ্বাস করেন। এই চরিত্র গুলোর সাধারণ গতি সমান্তরাল এবং কাহিনীর মত চরিত্রগুলোও নির্দ্বন্দ্ব। এর বিপরীতে অন্যদিকে রয়েছে মারোয়ান, আবদুল্লাহ জেয়াদ, সীমার জাতীয় চরিত্র—যারা পাষণ্ড, কুৎসিত ও হীন। নৈতিকতার বিচারে এ-চরিত্রগুলো অত্যন্ত অসৎ, এদের মধ্যে মানবিকগুণ নেই বললেই চলে। গোটা উপ-ন্যাসে একটি মাত্র চরিত্র রয়েছে, যাতে তাবৎ মানবিক আবেগ-অনুভূতি আরোপিত হয়েছে—সেটি এজিদ চরিত্র। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ, স্পষ্ট চরিত্র হচ্ছে— এজিদ। নীতিবিদের দৃষ্টিতে এজিদের ক্রিয়াকর্ম যত গর্হিত ও অভিশপ্ত বিবেচিত হোক না কেন, চরিত্রের বিচারে সাহিত্যিক মানদণ্ডে এজিদের মত প্রাণময় পূর্ণাবয়ব পুরুষ সমগ্র গ্রন্থে দ্বিতীয়টি নেই। এজিদ পাপী, ধর্মদ্রোহী ও ইন্দ্রিয়পরবশ। তথাপি "তিনি একজন প্রাণবান পুরুষ, যিনি বিচক্ষণ রাজনীতিতে, দক্ষ কূটনীতিতে, কুশল ও অকুতোভয় সমরক্ষেত্রে, প্রেমিক ব্যক্তিগত জীবনে, দানশীল তাঁর প্রজাদের ক্ষেত্রে।"[২৯] সে-কারণে তার পরিণতি পাঠককে অভিভূত করে। শিল্পী মশাররফ হোসেন অত্যন্ত যত্নসহকারে এ চরিত্র নির্মাণ করেছেন। মশাররফ হোসেনের এই মানবপ্রীতি ও শিল্পবোধ বিষাদ-সিন্ধুর ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে গুরুতর রূপে ব্যাহত করলেও[৩০] 'বিষাদ-সিন্ধু'র উপন্যাস গুণ সর্বাধিক বিকাশ

লাভ করেছে এজিদ চরিত্রকে অবলম্বন করে। এজিদের মনোদুঃখের সঙ্গে বিষাদ-সিন্ধুর সূত্রপাত এবং এজিদের ট্রাজিক পরিণতিতে এর সমাপ্তি।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নায়ক যেমন রাবণ, 'বিষাদ-সিন্ধু'র তেমনি এজিদ। হোসেন নন—এজিদই এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বলা যেতে পারে সমগ্র-ভাবে বিষাদ-সিন্ধু এজিদেরই কাহিনী। এজিদের জন্যেই লেখকের যতসব আয়োজন। হোসেনের ভূমিকা এখানে গৌণ। কারবালা আখ্যান উপন্যাসের হোসেন অংশ 'মহরম পর্ব্বে'ই সমাপ্ত। এজিদের লোভ-লালসা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, উত্থান-পতনের সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু'র পর্ব প্রবাহ এবং গতি পরিবর্তিত হয়েছে। সে কুশলী এবং সুনিপুণ সেনাধ্যক্ষ, কিন্তু কামনা-লালসার প্রবাহ প্রতিরোধে অক্ষম। সাধারণ দৃষ্টিতে এজিদ পাপী কিন্তু এই পাপের স্বরূপ অসামান্য—'দোদুল্যমান ফণির বিষাক্ত ফণায় যে সৌন্দর্য, এজিদের পৌরুষে দেখি তার নয়নাভিরাম দ্যোতনা।' এজিদ-অন্তরের অপ্রতিরোধ্য রূপতৃষ্ণা 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। রিপুশাসিত আবেগময়, পৌরুষ-দীপ্ত একটি বলিষ্ঠ মানুষ লেখকের শিল্প-দৃষ্টিতে নায়কের মহিমায় উদ্ভাসিত। "ইতিহাসের প্রকৃত মরুপ্রান্তর নয়, এজিদের প্রেমদীর্ণ হৃদয়ই এখানে কারবালায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিষাদের উত্তাল তরঙ্গসমূহের উৎস এজিদের হৃদয়-সিন্ধু।"[৩১] তাঁর এই প্রণয়-বিক্ষত আত্মপীড়ন ও দাহন অবক্ষয়ের মধ্যে আমরা শুনতে পাই মহাকাব্যের ট্রাজিক সুর। রূপজমোহ 'বিষাদ-সিন্ধু'র অন্যতম মৌলিক উপাদান। এজিদের শঠতা, হৃদয়হীনতা, পররাজ্যগ্রাস— সব কিছুর কেন্দ্রে মশাররফের চোখে সেই রূপজমোহ, যার সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখায় অসংখ্য নিরপরাধ নর-নারী, এমন কি এজিদ নিজেও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। এজিদ চরিত্রাঙ্কণে মশাররফ হোসেন যে প্রখর জীবনবোধ ও সৌন্দর্য-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন তার প্রমাণ মেলে উদ্ধার পর্বে। জয়নাবকে বন্দিনী করে আনা হয়েছে, এজিদের ব্যূহের মধ্যে তার অবস্থান। এই অবস্থায় জয়নাব কর্তৃক প্রেমের পুনঃ প্রত্যাখানে এজিদ মর্মাহত—

> কে না জানিল যে—দামেস্কের রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছেন। শত সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে ঔৎসুক্যের সহিত ব্যস্ত হইল, কেবল আপনার দুটি চক্ষুই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আড়ালে অন্তর্ধান হইল। ...এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিত প্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃণার্হ?[৩২]

এখানে এজিদ প্রণয় নিবেদনে যথার্থ প্রেমিক, কিন্তু তার মধ্যে কামুকতা নেই। তার মধ্যে ক্ষোভ আছে, বেদনা আছে—কাপুরুষতা নেই। সন্দেহ নেই তার অত্যাচারের মধ্যে নৃশংসতা আছে, কিন্তু কখনই তা হীনতায় বা ক্ষুদ্রতায় নেমে আসেনি। এজিদ একজন প্রেমিক, সে-কারণে রূপের আগুনে দগ্ধ। এজিদ একজন মানব, সে-কারণে সামগ্রিক হাসি ও কান্নাকে তিনি গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত সহজভাবে। শুধু তাই নয় এজিদ একজন দক্ষ শাসক-যিনি প্রজা পর্যায়ে সুবিচার প্রদানে বদ্ধ পরিকর, স্বীয় সভাসদদের সঙ্গে সর্ব বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে উৎসাহী, যুদ্ধক্ষেত্রে একজন অকুতোভয় সৈনিক। এমন মানবিক-আবেগ অনুভূতি আরোপ করে একটা চরিত্রে প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা এর আগে মুসলমান শিল্পীদের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। পুথিকার এবং সমসাময়িক অন্যান্য মুসলিম-লেখকদের সঙ্গে মশাররফ হোসেনের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। সত্যিই মানবীয় দোষগুণে অলংকৃত এজিদ চরিত্র বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি। এজিদ চরিত্র-পরিকল্পনায় মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। দুটি চরিত্রই অমিত বীর্যবান ও দুঃসাহসী। উভয় চরিত্রের বিরুদ্ধেই দুর্জেয় রহস্যের প্রাকার তুলে নিয়তি দণ্ডায়মান। এ-প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের বর্ণনার ছায়া যে মাঝে মধ্যে বিষাদ-সিন্ধুর উপর পড়েছে শুধু তাই নয়, মেঘনাদবধের দুটি চরিত্রের পরিকল্পনার সঙ্গে এর দুটি চরিত্রের পরিকল্পনার গভীর মিল রয়েছে। মেঘনাদবধের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রাবণ; তার শক্তি যেমন অপরিসীম, দুঃখ তেমনি অফুরন্ত। রাবণের মতই এজিদ শক্তিমান, কিন্তু তার কামনার ধন জয়নাবকে যে তিনি লাভ করতে পারেননি এই দুঃখে তার সমস্ত শক্তি বিপর্যস্ত—অস্থিরচিত্ততা তাঁর একমাত্র পরিচয়।[৩৩]

রাবণের সঙ্গে এজিদ চরিত্রের সাজুয্যকে স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়—মধুসূদনের রাবণের ট্রাজেডীর যে মহিমা, অনুরূপ এজিদ চরিত্রের উপর ট্রাজেডীর নায়কের মহিমা পুরোপুরি আরোপ করা মশাররফ হোসেনের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সমাপ্তি পর্বে এজিদের প্রাণভয়ে পলায়নের যে দৃশ্য তাতে একটি কাপুরুষের চিত্রই পরিস্ফুট। পূর্ববর্তী

পর্বসমূহে আমরা যে বীর নায়কের সাক্ষাৎ পাই এই পর্বের চতুর্থ প্রবাহে তার অপমৃত্যুই ঘটেছে বলা চলে। এ-কারণে পরাজয়ের মধ্যেও ট্র্যাজেডীর নায়কের যে মহিমা, এজিদ চরিত্রে তা অনুপস্থিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণ চরিত্রাঙ্কণে মধুসূদন তাঁর ব্যক্তিগত সহানুভূতির সঙ্গে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন, 'বিষাদ-সিন্ধু'র এজিদ চরিত্রে তা হয়ে ওঠেনি। শিল্পী ও ব্যক্তি-চৈতন্যের টানাপোড়েনে এখানে লেখক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। ব্যক্তিগতভাবে হোসেনের জন্যে লেখক ব্যথিত কিন্তু শিল্পী হিসেবে এজিদ-চরিত্রের প্রতি তিনি দুর্বল।

এজিদ ছাড়া আরো দুটি চরিত্রে মানবিক অনুভূতি আরোপ করা হয়েছে। এর একটি হলো 'হামান', অন্যটি ইমাম হাসানের দ্বিতীয় স্ত্রী জাএদা। রূপজমোহের পরেই 'বিষাদ-সিন্ধু'র অন্যতম উপাদান সপত্নীবাদ। বসন্ত-কুমারী নাটকে সপত্নীবাদের যে শৈল্পিক উন্মেষ আমরা লক্ষ্য করি, তার সার্থক পরিণতি ঘটে 'বিষাদ-সিন্ধু'র জাএদা চরিত্রে। জাএদা চরিত্রাঙ্কণে মীরের পারিবারিক অভিজ্ঞতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। এ-চরিত্রের মাধ্যমে মীর সাহেব সপত্নীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। জাএদা ইমাম হাসানের দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথমা হাসনে বানু আর তৃতীয়া হলেন জয়নাব। মীরেরও দুই স্ত্রী, প্রথমা আজিজন্‌নেসা আর দ্বিতীয়া বিবি কুলসুম। সপত্নীবাদের বিষময় কলহে মীরের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বস্তুত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এই উপাদানের সার্থক প্রয়োগ ঘটে জাএদা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতায় তিনি জানতেন এক হৃদয়ে দু'জনের ঠাঁই হতে পারেনা। এ সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি হলো: "সপত্নীবাদ কোথায় না আছে? ...এক অন্তরে দুই মূর্তির স্থাপন হওয়া অসম্ভব। ইহার পর তিনটি যে কি প্রকারে সংকুলান হইল, সমভাবে সমশ্রেণীতে স্থান পাইল তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসিল না।"[৩৪]

আজিজন্‌নেসা স্বামী ভাগ করে নিতে সম্মত নন। স্বামীকে সতীনের হাতে আর কেইবা দিতে চায়। তাই তিনি 'মীর সাহেব আলীর সহায়ে নুরুদ্দীন ডাকাতের সাহায্যে কুলসুম বিবিকে জগৎ হইতে সরাইতে পরামর্শ আঁটিয়াছেন।'[৩৫] কুলসুম বিবিকে নদীতে নিক্ষেপ বা বিষপানে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তা কার্যকর হয়নি। এই জীবন-অভিজ্ঞতাই বিষাদ-সিন্ধুর জাএদা চরিত্রের রহস্য উন্মোচনে তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা

করেছিল বলে আমাদের ধারণা। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই জাএদা চরিত্রের অন্তঃপুর নির্মাণে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল। অসুখী জাএদার চিত্তে মায়মুনা সুকৌশলে ঈর্ষার বীজ বপন করে, যা ধীরে ধীরে বিষবৃক্ষে রূপ নেয়। জাএদা প্রথমে মায়মুনার প্রলোভনে সাড়া দিলেও হোসেন হত্যায় কোন মতে রাজী হয়নি।[৩৬] কিন্তু ক্রমাগত প্রলোভন ও সপত্নী ঈর্ষার দাহনে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়। দুইবার ব্যর্থ হবার পর তৃতীয়বারে যখন সাফল্য এলো তখন জয়নাবের আর্তনাদ শুনে জাএদার যে মন্তব্য, তা প্রণিধানযোগ্য—

> তোকে কাঁদাতেই এই কাজ করিয়াছি। যদি স্বামীকে ভালবাসিয়া থাকিস তবে আজ কেন—চিরকালই কাঁদিবি···যদি জাএদা বাঁচিয়া থাকে, তবে দেখিস জাএদার মনের দুঃখের পরিমাণ কত? ···এইত আজ তোরই জন্য, পাপিয়সী···কেবল তোরই জন্য জাএদা আজ স্বামী-ঘাতিনী হইল, আজ আবার তোরই জন্য জাএদা এই স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল।[৩৭]

এতে স্বামীর প্রতি অব্যক্ত অভিমান ও সপত্নীর প্রতি ঈর্ষার যে প্রতিফলন তা জাএদা চরিত্রের মানবীয়তারই পরিচয় বহন করে। আজিজন্‌নেসার মত জাএদাও স্বামী ভাগ করে নিতে স্বীকৃতা নন, "জাএদা বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী ভাগ করিয়া লইবেনা।" সুতরাং স্বামীর প্রেম ও সোহাগ বঞ্চিতা জাএদা হাসান হত্যায় মেতে ওঠে। ক্রোধের মূল নব-যৌবনা জয়নাব, কিন্তু প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে স্বামী হত্যার পরিকল্পনায়।

জাএদা চরিত্রে পাপ ও পাপী দুটিই উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়েছে। হাসানের জন্যে লেখকের যত চিন্তা, জাএদার জন্যেও অনেকটা তাই। জঘন্য পাপের অধিষ্ঠাত্রী জেনেও জাএদার জন্যে আমাদের চিত্ত সমবেদনায় ব্যাকুল। পৈশাচিকতাও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আমাদের আচ্ছন্ন মানসকে অভিভূত করেছে। জাএদার জীবনের ট্রাজিডীতে তাই আমরা শোকাভি-ভূত। রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে মাটিতে দাঁড়ান এমন জীবন্ত ও বাস্তব চরিত্র সত্যিই দুর্লভ।

মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ আর একটি চরিত্র হলো হামান। হামান এজিদের সভাসদ হলেও অন্যান্যদের মত তিনি কুটিল ও স্বার্থপর নন। যে-কারণে এজিদের সঙ্গে অনেক সময় তাঁর মতভেদ হয়েছে এবং এ-কারণে তিনি

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কারাগারে হামানের স্বগতোক্তি একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের কথা মনে করিয়ে দেয়। কারণ তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারেন—

> রাজার অভাব হইলে রাজ্য পাওয়া যায়, রাজ বিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্য মধ্যে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলেও যথা সময়ে অবশ্যই নির্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দমনীয় তেজও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী জল প্লাবণ ইত্যাদি দৈব দুর্বিপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম বোধ হইলেও নিরাশা সাগরে ভাসিতে হয়না—আশা থাকে··· কিন্তু স্বাধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে মহামূল্য রত্ন হস্তগত হয়না। স্বাধীনতার সূর্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা। ৩৮

রাজ্য ও রাজা-প্রজার ভেতর পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর অনুভূতি আরও স্বচ্ছ। কারণ তিনি জানেন—

> রাজা আর রাজ্য, এই দুইটি পৃথক কথা—পৃথকভাব—পৃথক সম্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধি দোষে অপদস্থ হউন, সৎযুক্তি সুমন্ত্রণায় অবহেলা করিয়া পর পদতলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? কার্য্যানুরূপ ফল, পাপানুযায়ী শাস্তি। ···রাজা প্রজারক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং কর সংগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য প্রজার। রক্ষার দায়িত্ব বাসিন্দা মাত্রেরই। ৩৯

এই মন্তব্যের অন্তরালে যে একটি আধুনিক সচেতন মন তার সম্পূর্ণ অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছে, তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। এ-কারণেই এজিদের হাতে নিগৃহীত হয়েও এজিদের জন্যে তিনি চিন্তিত এবং এজিদের পরিণতির কথা শুনে "দেখিবার মধ্যে দেখা গেল—চক্ষের জল, আর শুনিবার মধ্যে শুনা গেল—দীর্ঘ নিশ্বাস।" এ চরিত্রটি মশাররফ হোসেনের দেশপ্রেম ও অগ্রসর চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর বহন করে। এবার আমরা অন্যান্য চরিত্র আলোচনা করবো।

মারোয়ান মাবিয়ার জীবিতকালেই এজিদের দক্ষিণ হস্ত রূপ মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। প্রথম থেকেই আমরা অসম্ভব কৌশলী কূটনীতিক মারোয়ানের ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে পরিচিত হই। মারোয়ানই কৌশল ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে জব্বার ও জয়নাবের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। জয়নাব লাভের আশায় মারোয়ান এজিদকে সর্বক্ষণ সাহায্য করেছে। এজিদের শত্রু হাসানকে সংহার করার জন্যে মায়মুনাকে খুঁজে বের করাও তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। মারোয়ান পাষণ্ড চরিত্র হলেও এক-আধবার তিনি সদগুণের পরিচয় দিয়েছেন। মৃত হোসেনের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি তিনি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন। বিচক্ষণতাও তাঁর কম ছিল না—তিনি বারংবার বাধা দিয়েছেন যাতে এজিদ জয়নাল আবেদীনকে হত্যা না করে। তাঁর উপদেশেই এজিদ হানিফার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। মাবোয়ান প্রভুভক্ত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মাঝে মধ্যে তিনি প্রভুর কার্যকে সমর্থন করতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এজিদের মান রক্ষার্থে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। হানিফার হস্তে তাঁর মৃত্যু ঘটে। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কৃত অপকর্মের জন্যে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

মায়মুনা এক পাষণ্ড নারী। তিনি হলেন সুযোগ-সন্ধানী। প্রকৃত-পক্ষে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই এই চরিত্রের স্থষ্টি। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি তিরোহিত হয়ে যান। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে, বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গলের 'দুর্বলা দাসীর' সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। অর্থের জন্যে কি জঘন্য পাপ মায়মুনা করেছিলেন, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

অনুরূপ আর একটি চরিত্র হচ্ছে সীমার। তিনি সাহসী বীর বটে, কিন্তু লোভী। অর্থই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। অর্থের জন্যে তিনি নীতি-আদর্শ ইত্যাদি সব কিছু বিসর্জন দিতে পারেন। নৃশংসতাই তার অস্ত্র। হোসেনকে হত্যা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, আজরের প্রাণও বিনাশ করেছেন শুধু অর্থের কারণে। হানিফার হস্তে তাঁর মৃত্যু ঘটে কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেও কৃত-কর্মের জন্যে তাঁর কোন অনুশোচনা দেখা যায়না। এই সমস্ত চরিত্রের কোন বিকাশ লেখক দেখাননি বা দেখাতে পারেননি।

হযরত মোহাম্মদ (রাঃ)-এর বংশধরদের সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা চলে যে, এঁরা ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন সৎ, ধার্মিক। এঁরা জনগণের পরম শ্রদ্ধেয়

ব্যক্তি। হাসান ও হোসেন হযরতের দৌহিত্র সুতরাং সকল মুসলমানের কাছে শ্রদ্ধার্হ। হাসান তার স্ত্রী জাএদাকে মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমা করে এবং হোসেনকেও ক্ষমা করার উপদেশ দিয়ে তাঁর চারিত্রিক ঔদার্য ও মহত্ত্বকে প্রকাশ করে যান। হোসেন হযরত আলীর উপযুক্ত পুত্র। তিনি একজন বীর যোদ্ধা ও সাহসী পুরুষ। মদিনা থেকে এজিদের সেনাবাহিনীকে একবার বিতাড়িত করেছিলেন এই হোসেন। কারবালার প্রান্তরে অসীম সাহসের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছেন, যদিও সর্বক্ষণ দৈবকেই বিশ্বাস করতেন। বিনা প্রতিবাদে তিনি মৃত্যুকে বরণ করেন, কারণ বিধাতার তাই অভিপ্রায়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর হন্তা সীমারকে ক্ষমা করে হাসানের মত তিনিও তাঁর চারিত্রিক ঔদার্য ও মহত্ত্বকে প্রকাশ করে যান।

মোহাম্মদ হানিফা হযরত আলীর সন্তান এবং একজন সাহসী পুরুষ। হোসেনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এজিদ ও মারোয়ান তাঁর নামে শঙ্কিত হয়ে পড়েন কিন্তু তিনিও দৈবের হাতের ক্রীড়নক। দৈব-কারণেই, হাতের কাছে পেয়েও এজিদকে তিনি নিধন করতে পারেন নি। তবে নিয়তির বিধানকে অলঙ্ঘ্য জেনে, যেখানে অধিকাংশ চরিত্রই সংগ্রাম-বিমুখ, সেখানে হানিফা চরিত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। জয়নাব লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত জেনেও এজিদ আত্মঘাতী পরিণামের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনুরূপ 'এজিদ অবধ্য' এই দৈববাণী উচ্চারিত হবার পরও হানিফা ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ করতে পারেন নি। দৈববাণী প্রভাবিত হলেও হানিফা চরিত্রের উন্মোচনে নাটকীয়তার অবকাশ ছিলো। গ্রীক ট্রাজেডীতে যেমন নিয়তিকে অস্বীকার করতে গিয়েই মানব-মহিমার উজ্জ্বল উন্মেষ ঘটে, এ চরিত্রেও অনুরূপ নাটকীয় সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। সম্ভবতঃ পরিণামের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্বারোপের কারণে তা যথাযথ রূপ লাভ করতে পারেনি। সমগ্রভাবে বলতে গেলে এ-সকল চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখকের তেমন কোন কৃতিত্ব নেই। বরং বলা চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। যে-সকল চরিত্র ধর্ম এবং নীতি-আদর্শের প্রতিভূ তাদের ভেতর মর্ত্য-মানবের প্রাণ-চাঞ্চল্য নিতান্তই অনুপস্থিত। ধর্মীয় ও সামাজিক সনাতন আদর্শের দিক থেকে তাঁদের ভেতর পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের আদর্শ চরিত্রে যে জীবন-স্পন্দন একান্ত কাম্য, তার অভাবে চরিত্রগুলো কৃত্রিম অভিনয় করেই ক্ষান্ত হয়ে পড়েছে। এইসকল চরিত্র প্রচুর পরিমাণে উত্তম বাক্য

উচ্চারণ করেছে, ইতস্ততঃ বিচরণ করেছে কিন্তু দোষে-গুণে মিলিয়ে মানবীয় আচরণের পরিচয় প্রদান করেনি।

সবশেষে আমরা আর একটি চরিত্রের উল্লেখ করবো তা হলো জয়নাব। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সমস্ত ঘটনাই জয়নাবকে কেন্দ্র করে। এজিদ ও হাসান হোসেনের সংঘর্ষের মূল কারণ জয়নাব। জয়নাব সতী-সাধ্বী স্ত্রী। প্রথম স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে দ্বিতীয়বার পরিণীতা হন হাসানের সঙ্গে। ভাগ্যের পরিহাসে হাসানের মৃত্যুর পর তিনি এজিদের কারাগারে বন্দিনী হন। এখানে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্যের' 'সীতা' চরিত্রের সঙ্গে এই বন্দিনী জয়নাবের তুলনা চলে। প্রকৃত অর্থে যে জয়নাবের জন্যে এত রক্ত পাত, এত ধ্বংসযজ্ঞ উপন্যাসে সে জয়নাব প্রায় নেপথ্যেই অন্তর্নিহিত।[৪০] অথচ গুরুত্বের বিচারে জয়নাব অন্যতম একটি মূল্যবান চরিত্র। এজিদের জন্যে যেখানে লেখকের এত আয়োজন সেখানে প্রতি-তুলনায় জয়নাব চরিত্র একেবারেই নিষ্প্রাণ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবাবেগের প্রাবল্য মশাররফ হোসেনকে চরিত্র-স্রষ্টা ঔপন্যাসিকের আসন থেকে বিচ্যুত করেছে। অপ্রতিরোধ্য উচ্ছ্বাস-প্রবণতার দরুণ প্রয়োজনীয় নির্লিপ্ততা তিনি রক্ষা করতে পারেননি। ফলে চরিত্র সৃষ্টিতে প্রায়শঃ তিনি সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছেন। "ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যেই তাঁর গ্রন্থে চরিত্রের বৈচিত্র্যের পরিচয় যথেষ্ট থাকলেও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টি কমই সম্ভবপর হয়েছে।"[৪১] সম্ভবত এই ভাবোচ্ছ্বাস আয়ত্ত করতে সক্ষম হলে মশাররফ হোসেনের লেখনীতে এজিদ-জাএদার ন্যায় আরও কতিপয় সার্থক চরিত্র সৃষ্টি হতো।

ভাষা

'বিষাদ-সিন্ধু' বাংলাদেশের এককালের অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। এই জন-প্রিয়তার কারণ শুধু বিষয়বস্তুগত নয়। এর ভাষার অপূর্ব উন্মাদনী শক্তি, অপরূপ সঙ্গীতময়তা ও স্বচ্ছ সাবলীল প্রবাহ, যা পাঠক ও শ্রোতাকে দারুণ ভাবে আকর্ষণ করে। মশাররফ হোসেনের ভাষা-বৈশিষ্ট্য এর আগেই পাঠক ও সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'বিষাদ-সিন্ধু'র এই নতুন-অপূর্ব বৈশিষ্ট্য পাঠক মনে নতুনভাবে চমক সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে 'বিষাদ-সিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর অপরূপ ভাষাশৈলী।

'বিষাদ-সিন্ধু' সাধু ভাষায় রচিত। সমস্ত ক্রিয়াপদগুলিই সাধু ভাষায়। এতে সংস্কৃত তৎসম শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। বিভিন্ন কারণে এর মধ্যে 'কতকগুলি' জাতীয় শব্দের' ব্যবহারও তিনি করেছেন। এই 'জাতীয় শব্দ' ব্যবহারের কারণে তিনি সংকোচ বোধ করেন এবং এর জন্যে বিনয়ের সঙ্গে মার্জনা ভিক্ষে করেন। আমাদের মনে হয় লেখকের এই মার্জনা ভিক্ষের বিশেষ প্রয়োজন ছিলনা। ইসলাম বা মুসলিম-জীবনের বিষয় নিয়ে কাহিনী রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ তিনি করেছেন, কিন্তু তাও সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। 'বিষাদ-সিন্ধু'র আনুমানিক শব্দ সংখ্যা-১২৭০০০ ; এর মধ্যে ২০০ কিংবা তার চাইতে কিছু বেশী সংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দ (পুনরুক্তি ছাড়া) ব্যবহার করা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে এই 'জাতীয় শব্দে'র সংখ্যা অতিঅল্প। এ-ছাড়া ইসলাম বা মুসলিম-জীবন সম্পর্কিত কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রেও মশাররফ হোসেন 'জাতীয় শব্দের' পরিবর্তে বাংলা বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'আল্লাহ্' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন 'ঈশ্বর'।

'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সমকালীন বাংলা গদ্যের পটভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে। এই কালে বাংলা গদ্য প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপী পথ পরিক্রমার অন্তে এক মহিমান্বিত সমুন্নতিতে উত্তীর্ণ। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের অঙ্গনে পিতামহের আসনে সমাসীন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মধ্যগগনে বিরাজিত। বিষাদ-সিন্ধুর কালে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ মহৎ রচনা প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই পর্বে বাংলা গদ্যের পরিমণ্ডল বিশেষ করে বঙ্কিমী দীপ্তিতে ভাস্বর—বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত গদ্যভঙ্গী সর্বজন অনুসৃত গদ্যাদর্শ। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমীযুগেই মশাররফ হোসেনের গদ্যসাধনার সূত্রপাত এবং এ-যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করে। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর গদ্য বঙ্কিমী-গদ্যের প্রেরণাতেই সঞ্জীবিত। মশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধু প্রকাশের (মহরম পর্ব্ব) তিন বৎসর পূর্বে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'। বঙ্কিমী-গদ্যের প্রারম্ভে 'দুর্গেশ-নন্দিনী' (১৮৬৫), পরিণতির কোটিতে 'রাজসিংহ'। 'রাজসিংহে'র রচনা-ভঙ্গীর সংযম, গতিবেগ ও সাবলীলতা 'বিষাদ-সিন্ধু'তে অনুপস্থিত ; তথাপি এই গ্রন্থের গদ্য রচনায় লেখক প্রায় বঙ্কিমের দ্বারাই প্রভাবিত, যদিও বিষাদ সিন্ধুর স্টাইলটা মশাররফের সম্পূর্ণ নিজস্ব। মশাররফের সঙ্গে বঙ্কিমের এই যোগাযোগ সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> মধুসূদন ও বঙ্কিমের যুগে মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কত ঘনিষ্ঠ নানাদিক দিয়ে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। তাঁর বাক্যের গঠন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুযায়ী—অবশ্য কিছু বেশী বাক্ বাহুল্য তাতে আছে, তার মন্ত্রী ও সেনাপতি-দের মন্ত্রণায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে এবং স্বাধীনতার জন্য দরদেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বুঝতে পারা যায়।[৪২]

রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ' সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "এই উপন্যাসে ঘটনার দ্রুত ধাবমানতায় পাঠকও অগ্রসর হতে থাকে।"[৪৩] ঘটনার এই দ্রুত ধাবমানতা 'রাজসিংহ'কে দিয়েছে এক তাৎপর্যপূর্ণ মহিমা। ঠিক একই কথা 'বিষাদ-সিন্ধু' সম্পর্কেও বলা যেতে পারে। গদ্যের যে একটা দীপ্ত-প্রবহমানতা আছে 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তারই পরিচয় মেলে। বিষাদ-সিন্ধুর ভাষা সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই এর গদ্যছন্দ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কবিতার মত গদ্যেও রয়েছে এক প্রকার ছন্দ। এই ছন্দই গদ্যকে করে তোলে কাব্য-সুষমামণ্ডিত। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে এই ধরনের গদ্য ছন্দের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে।[৪৪] 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর সংগীতধর্মিতা। এর ভাষায় একটি সুষম সংগীত মাধুর্য প্রবহমান। গদ্য ভাষার অন্তর্লীন সংগীত-প্রবাহ গ্রন্থটিকে বহুলাংশে কাব্যসৌন্দর্য দান করেছে। যেমন—

> হোসেন গননা করিয়া দেখিলেন, আজ মহরম মাসের ৮ তারিখ। তাহাতে " ভয়ে ভয়ে অশ্বে কষাঘাত করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া দেখিলেন যে, এক পার্শ্বে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। চক্ষু নির্দিষ্ট সীমা মধ্যে মানব-প্রকৃতি জীব-জন্তুর নাম মাত্র নাই। আতপ তাপ নিবারণোপযোগী কোন প্রকার বৃক্ষও নাই, কেবলই প্রান্তর—মহাপ্রান্তর। প্রান্তর সীমা যেন গগনের সহিত সংলগ্ন হইয়া ধুধু করিতেছে। চতুর্দ্দিকে যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বরে আক্ষেপ—"হায়! হায়!!" শব্দ উত্থিত হইয়া নিদারুণ দুঃখ প্রকাশ করি-তেছে। জনপ্রাণীর নাম মাত্র নাই, কে কোথা হইতে শব্দ করিতেছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। বোধ হইল যেন শূন্য পথে শত সহস্র মুখে "হায়! হায়!!" শব্দে চতুর্দ্দিক আকুল করিয়া তুলিতেছে।[৪৫]

বিষাদ-সিন্ধুর গদ্যে যে সংগীতময়তা অন্তর্নিহিত, যে ছন্দ-স্রোত প্রবহমান—সুষম যতি বিন্যাসের ফলেই তা মাধুর্যমণ্ডিত এবং বেগবান হয়ে উঠেছে।

এ-গ্রন্থে প্রায় সর্বত্রই এর পরিচয় পাওয়া যাবে। মহরম পর্ব থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

> হোসেন সকরুণ স্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সঙ্গিগণকে বলিতে লাগিলেন, ভাই সকল, হাস্য পরিহাস দূর কর; সর্বশক্তিমান জগৎ নিদান করুণাময় ঈশ্বরের নাম মনে কর। আমরা বড় ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানের নাম করিতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে, প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। ভাইরে! মাতামহ বলিয়া গিয়াছেন, যে স্থানে তোমার অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া যাইবে, নিশ্চয় জানিও সেই তোমার জীবন বিনাশের নির্দিষ্ট স্থান এবং তাহারই নাম "দাস্ত কারবালা"। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়, পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় আসিয়াছি আর সন্দেহ নাই।[৪৬]

কল্পনা এবং যথাযথ শব্দ ব্যবহারের ফলে 'বিষাদ-সিন্ধু'র এই ভাষা কখনো কখনো সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতায় এমন সুষমামণ্ডিত হয়ে ফুটে ওঠে যে, একে তখন ভাস্কর্যের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। যেমন—

> ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই। একটি সামান্য বৃক্ষপত্রে তাঁহার শত সহস্র মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। একটি পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকে তাহার অনন্ত শিল্পকার্য বিভাসিত হইতেছে। অনন্ত বালুকারাশির একটি ক্ষুদ্র বালুকণাতে তাঁহার অনন্ত করুণা আঁকা রহিয়াছে।...তাহার লীলাখেলার মাধুর্য, কীর্তি কলাপের বৈচিত্র্য, বিশ্ব-রঙ্গভূমির বিশ্ব-ক্রীড়া একবার পর্যালোচনা করিলে ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি বিচেতন হয়।[৪৭]

কখনো আবার নাটকীয় স্বগতোক্তিতে এই ভাষার অন্তর্নিহিত গতিশীলতা চমৎকার প্রতিফলিত। যেমন—

> কেন হেরিলাম? সে জ্বলন্ত রূপ রাশির প্রতি কেন চাহিলাম? হায়! হায়! সেই একদিন আর আজ একদিন। কি প্রমাদ! প্রেমের দায়ে কিনা ঘটিল! কতপ্রাণ-ছি! ছি! কতপ্রাণ বিনাশ হইল। উহু! কি কথা মনে পড়িল। সে নিদারুণ কথা কেন এমন মনে হইল?[৪৮]

'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনী রচনা করতে গিয়ে মশাররফ হোসেন শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বিষাদ-সিন্ধুর মর্মবিদারী বিষাদময়

ঘটনা বর্ণনা এবং এর অপ্রতিরোধ্য আবেগ ও মর্মস্পর্শী ভাবকে ধারণ করার মতো শব্দ লৌকিক শব্দ-সম্ভারে নেই বলে এই গদ্য-শিল্পী বারংবার তৎসম শব্দ-ভাণ্ডারের দ্বারস্থ হয়েছেন। এইক্ষেত্রে তাঁকে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের উত্তরসূরী বলা চলে।

এই গ্রন্থে বাক্য রচনার ক্ষেত্রেও লেখক বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনায় যেখানে বেগ সঞ্চারের প্রয়োজন, সেখানে পর পর স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাক্য যোজনা করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রশ্নবোধক বাক্যের সহায়তায় একটি চিত্রকে জীবন্ত ও চলমান করে তোলার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন—

> এ কি ! প্রহরিগণ ছুটাছুটি করে কেন ? প্রহরিগণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে। যে যেখানে ছিল, সে স্থান হইতে ছুটিয়াছে। পরস্পর দেখা হইতেছে, কথা হইতেছে,—কিন্তু বড় সাবধানে—চুপে চুপে। কথা কহিতেছে—পরামর্শ করিতেছে—সাবধান হইতেছে—আত্মরক্ষার উপায় দেখিতেছে। কেন? কি সংবাদ? দেখুন আশ্চর্য্য দেখুন। একজন প্রহরী ছুটিয়া আসিল যুদ্ধমন্ত্রী হামানের কানে কানে চুপি চুপি কি কহিয়া, ঐ দেখুন কি করিল।[৪৯]

বাক্য যোজনার ক্ষেত্রে পুনরায় লক্ষ্য করা যাবে যে, পর পর গ্রথিত বাক্য-সমূহ ক্ষুদ্রায়তন থেকে ক্রম দৈর্ঘ্যে বিস্তার লাভ করেছে। ক্রম বিকশিত ভাবনা, কল্পনা কিংবা অনুভূতির বর্ণনায় লেখক এই জাতীয় বাক্য সংযোজনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন—

> আশা মিটিবার নহে, মানুষের মনের আশা পূর্ণ হইবার নহে। ঘটনার সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেকের মনে অনেক প্রকারের আশার সঞ্চার হয়। আশার কুহকে মাতিয়া অনেকে পথে অপথে ছুটিয়া বেড়ায়।[৫০]

বাক্যে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব, ওজোগুণ ও গাম্ভীর্য সঞ্চারের জন্যে মশাররফ হোসেন সন্ধি ও সমাসযুক্ত শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি, 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষায় অনুপ্রাস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয়। বর্ণযোজনার কুশলী ক্রীড়ায় শব্দের অভ্যন্তরে তিনি ধ্বনি ঝংকারের সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

ক. কাশেমের শোকাগ্নি আজ শত্রু শোণিতে পরিণত হউক।[৫১]

খ. যেদিন রমণী-মুখ চন্দ্রিমার সামান্য আভায় ধরণী পতির মস্তক ঘুরিয়াছে…ইত্যাদি ।[৫২]

শুধু তাই নয়, 'বিষাদ-সিন্ধু'তে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ইত্যাদি প্রয়োগেও মশাররফ হোসেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই সমস্ত অলংকারের ব্যবহার অবশ্য সংস্কৃত-সাহিত্য থেকেই বাংলায় এসেছে। তবে এগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা লক্ষণীয় :

ক. যে দিন এজিদের নয়ন-চকোর জয়নাবের মুখ চন্দ্রিমার পরিমল সুধা পান করিয়াছে, সেই দিন এজিদ জয়নাবকেই মনপ্রাণ সমর্পন করিয়া জয়নাব রূপ-সাগরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে।[৫৩]

খ. প্রতিনিধির বাক্য বজ্রাঘাতে সুখ স্বপ্ন-তরু দগ্ধীভূত হইল।[৫৪]

গ. যদি জাএদা সপত্নীর ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত না হইতেন তবে কি আজ জাএদা বিবেচনা তুলদণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পত্তি সুখ সমুদয় একদিক আর স্বামীর প্রণয়, প্রাণ—ভিন্নদিকে ঝুলাইয়া পরিমাণ করিতে বসিতেন ? [৫৫]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ঐতিহাসিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে 'বিষাদ-সিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর ভাষা। বস্তুতঃ এই ভাষা-বৈশিষ্ট্যই বিষাদ সিন্ধুকে কালজয়ী করেছে। বিষাদ-সিন্ধুর ভাষার এই বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজী আবদুল ওদুদ যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—"বর্তমানের খেয়া পার হয়ে ভাবীকালের তীরে মীরসাহেব যদি পৌঁছতে সক্ষম হন তবে রচনার বহুলতা দিয়ে পারবেন না, পারবেন বিষাদ-সিন্ধুর লিপিকুশলতার গুণেই।"[৫৬]

'বিষাদ-সিন্ধু' প্রথম পর্ব (মহরম পর্ব্ব) প্রকাশের পর এই গ্রন্থের ভাষা মুসলমান সমাজে নিন্দিত হয়েছিল। স্ব-সম্প্রদায়ের শিল্প-বিমুখতায় মশাররফ হোসেন পীড়িত হয়েছিলেন তাই আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—

কবি কল্পনার সীমা পর্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে, কল্পনা-কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের

খাতিরে নানাদিক লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবান! সমাজের মূর্খতা দূর কর। কুসংস্কার তিমির সদ্‌জ্ঞান জ্যোতি-প্রতিভায় বিনাশ কর।[৫৭]

এখানে তিনি একজন সচেতন শিল্পী হিসেবেই বাঙালী মুসলমানদের শিল্প-বিমুখতা ও মূঢ়তায় ব্যথিত এবং এই অজ্ঞতার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ বাংলায় সাহিত্য স্থষ্টির দুঃসাহসিক সাধনায় নিবেদিত-প্রাণ। এটি তাঁর শৈল্পিক ও সমাজ-সচেতনতারই পরিচয় বহন করে।

যদিও ভাষা-বৈশিষ্ট্যই বিষাদ-সিন্ধুর বড় সম্পদ, তবে এর ত্রুটিও কম নয়। এই গ্রন্থে ভাষার ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি তাঁর সংযমের অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যে সংযম ও পরিমিতি-বোধ লক্ষণীয়, মশাররফের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। "রোমান্টিক কবির যে ভাবোচ্ছ্বাস—একই সঙ্গে সেইটি 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থের শক্তি ও দুর্বলতার কারণ। এই ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যই তার গ্রন্থে চরিত্রের বৈচিত্র্যের পরিচয় যথেষ্ট থাকলেও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র স্থষ্টি কমই সম্ভবপর হয়েছে।"[৫৮] লেখকের সংযম ও পরিমিতি-বোধ যে গ্রন্থের ভাষায় বিস্ময়কর ব্যঞ্জনা ও রসের স্থষ্টি করতে পারতো, তা হয়তো মশাররফ হোসেনের জানা ছিলোনা বা জানা থাকলেও তার জন্যে যে শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োজন, তা হয়তো তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। ভাবের উন্মাদনা অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীকে পরাভূত করেছে—ফলে বাক্যের সঙ্গে বাক্য যোজনাতেই তিনি স্ফূর্তিলাভ করেছেন, লক্ষ্য করতে পারেননি যে, তাতে শুধু বাক্যের পরিমাণগত বৃদ্ধিই ঘটেছে, শৈল্পিক কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি—শুধু ফুল চয়ন করেই গেলেন, মালা গাঁথতে পারেননি। মহরম পর্বের পরবর্তী পর্বগুলোতে এই বাক-বাহুল্য ও সংযম-হীনতার ফলে পূর্বের সেই গাঢ়বদ্ধতা আর দেখা যায় না। এই দুই পর্বে পূর্বোক্ত দোষ-গুলিই প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে সু-গ্রথিত তিনটি পর্ব সু-সমঞ্জস্য বাণীরূপ নিয়ে পাঠকের সামনে হাজির হতে পারেনি।

মশাররফের ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তিনি উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন অলংকারের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহুল্যতা মশাররফ হোসেনের রচনাকে অনেক ক্ষেত্রে জটিল ও পীড়াদায়ক করে তুলেছে। যেমন—

হুতাশনের দহন আশা, ধরণীর জলশোধন আশা, ভিখারীর অর্থ-লোভ আশা, চক্ষুর দর্শন আশা, গাভীর তৃণ ভক্ষণ আশা, ধনীদের ধন বৃদ্ধির আশা, প্রেমিকের প্রেমের আশা, সম্রাটের রাজ্য বিস্তার আশার যেমন নিবৃত্তি নাই, হিংসাপূর্ণ পাপহৃদয়ে দুরাশারও তেমনি নিবৃত্তি নাই—ইতি নাই। যতই কার্যসিদ্ধি, ততই দুরাশার শ্রীবৃদ্ধি।[৫৯]

এখানে এক দুরাশার সঙ্গেই আটটি বিভিন্ন বিষয়ের উপমা দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের অতিরিক্ত রূপক-সমাসোক্তি ব্যবহারের ফলেও অনেক ক্ষেত্রে ভাব জটিল এবং অর্থ দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। যেমন, "সার্থ প্রসবিনী গর্ভ-পাতী আশা যতদিন সন্তান প্রসব না করে ততদিন আশাজীবী লোকের সংশিত মানসাকাশে ইষ্ট চন্দ্রের উদয় হয়না।"[৬০] এই ধরনের বর্ণনায় লেখকের গভীর জীববোধের পরিচয় মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হয়েছে সত্য—কিন্তু এই সব বর্ণনায় অসংবৃত উচ্ছ্বাস কাহিনীর কেন্দ্রীয় মনোযোগের জন্যে কখনোই লাভজনক হয়নি।

'বিষাদ-সিন্ধু'তে একটি সুষম সঙ্গীত-মাধুর্য প্রবহমান—সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বত্র তা যথার্থ রূপ লাভ করতে পারেনি লেখকের স্বভাবজ দুর্বলতা-সংযমের অভাবের জন্যে। বর্ণনায় মাত্রাবোধ সম্বন্ধে তিনি সংহত, সংযত ও সচেতন নন। অনর্গল ঝোঁকের মাত্রাই অসংযত বাক্‌বাহুল্যে—সুসংহত, সুষম ধ্বনি-বিন্যাসের মাধুর্যে ছন্দ-পতন ঘটিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়, "অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুল-কাব্যের প্রধান দোষ এবং গুণ।" এই কথা 'বিষাদ-সিন্ধু' সম্পর্কেও একইভাবে প্রযোজ্য।

ভাষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত দুর্বলতা-সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠকীর্তি 'বিষাদ-সিন্ধু' এবং এই 'বিষাদ-সিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর ভাষা। সত্যিই এর ভাষার উর্মিমুখর তরোঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যেই মীর সাহেবের সাহিত্যিক প্রতিভাও যথার্থ বিকশিত হয়ে উঠেছে।[৬১]

সমগ্রভাবে 'বিষাদ-সিন্ধু'র সাফল্য এর ভাষা ও কতিপয় চরিত্র-চিত্রণে এবং মীর-মানসের দেশপ্রেম ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনে। এ-ছাড়া এই উপন্যাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর কল্পনা-গুণ। এই কল্পনা 'বিষাদ-সিন্ধু'কে দিয়েছে এক নতুন মহিমা। এই কবি-কল্পনা সম্পর্কে স্বয়ং লেখকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। স্বসমাজের শিল্প বিমুখতায় পীড়িত

লেখক উদ্ধার পর্বের চতুর্থ প্রবাহে (পৃ. ২৭৪) লিখেছেন, "কবি-কল্পনার সীমা পর্য্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে কল্পনা-কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানাদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে।" 'কল্পনা-কুসুমে' মনোমত হার গেঁথে পাঠক-পাঠিকার পবিত্র গলায় দোলানোর যে একাগ্র বাসনা লেখকের ছিলো, তাতে (তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে) কতটুকু সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন তা আমরা জানিনা। তবে কবির এই শক্তি যে 'বিষাদ-সিন্ধু'কে এক নতুন মহিমা দান করেছে, তা বলাবাহুল্য। "আবদুল জব্বারের কুটির থেকে এজিদের রাজপ্রাসাদ, কারবালার ধু-ধু প্রান্তর থেকে এজিদের দ্বন্দ্ব-পীড়িত অন্তর পর্যন্ত এই কল্পনার আঁখিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"[৬২] সম্প্রদায় বিশেষের একটি ধর্মীয় ঘটনা প্রতিভাবান শিল্পীর কল্পনায় কিভাবে অভিনব সার্থকতা খুঁজে পায়, সর্ব-সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে—'বিষাদ-সিন্ধু' তারই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

'বিষাদ-সিন্ধু'র সাফল্য অনেক থাকলেও এর সীমাবদ্ধতাও কম নয়। যে কল্পনাশক্তি এর অন্যতম প্রধান গুণ, সেই কল্পনাশক্তিকে ইতিহাসের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে মশাররফ হোসেন উপন্যাসের কালগত সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেননি। উপক্রমণিকার শেষ চরণ এবং মহরম পর্বের প্রথম প্রবাহে যে তরুণ এজিদের সাক্ষাৎ আমরা পাই তার সঙ্গে সপ্তম প্রবাহে বর্ণিত এজিদের বিরাট পার্থক্য লক্ষণীয়। এই সপ্তম প্রবাহে লেখক বলেছেন, 'এজিদের সহিত (হাসানের) বাল্যকালে বাল্যক্রীড়ায় ঝগড়া বিবাদ হইত, এজিদ তাহাদের দুই ভ্রাতাকেই দেখিতে পারিতনা।' এই বর্ণনানুসারে হাসান-হোসেন ও এজিদ প্রায় সমবয়স্ক। কিন্তু উপন্যাসের প্রারম্ভে এজিদ যখন মাত্র তরুণ, তখন হাসান-হোসেন উভয়েই সন্তানের জনক। বলাবাহুল্য, এই অসঙ্গতি মশাররফ হোসেনের চোখ এড়িয়ে গেছে। তা না হলে, যেখানে প্রতি সংস্করণেই 'বিষাদ-সিন্ধু' উন্নত অবস্থায় পরিবর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে কোনও এক সংস্করণে এর সংশোধন হতে পারতো।

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের মূল কাহিনীর পাশাপাশি একাধিক উপ-কাহিনী সংযোজন এর মূল কাহিনী-বিন্যাসকে শ্লথ করে দিয়েছে। মোসলেমের কিশোর পুত্রদ্বয়ের জন্যে অর্থলিপ্সু হারেস কর্তৃক স্ত্রী ও সন্তান হত্যা এবং

সীমারের হাত থেকে হোসেনের মস্তক রক্ষার জন্যে পৌত্তলিক আজরের সপরিবারে আত্মাহুতির ঘটনার যে দীর্ঘ বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, তা মূল কাহিনীতে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনা। উপরন্তু এই ধরনের উপ-কাহিনী উপন্যাসের মূল আবেগ সংহত হবার ক্ষেত্রে বারে বারে বিড়ম্বনারই সৃষ্টি করেছে।

মিশ্র ভাষারীতির কাব্যকারদের মতো মীর মশাররফ হোসেন তাঁর উপন্যাসে আকস্মিক জটিলতা এবং অলৌকিক সমাধানের পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এইসব আকস্মিকতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার যে শ্রম ও প্রযত্ন, তা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত।

অতিকথন ও আবেগতাড়িত হয়ে লেখক অনেক সময় কাহিনীর কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে সরে পড়েন। ফলে গল্পরস জমাট বেঁধে উঠতে পারেনি এবং সমগ্রভাবে উপন্যাসের সুগ্রথিত তিনটি পর্ব সু-সমঞ্জস বাণীরূপ নিয়ে পাঠকের সামনে হাজির হতে পারেনি।

উৎস-নির্দেশ

১ মুনীর চৌধুরী মনে করেন 'বিষাদ-সিন্ধু'ই মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (মীর-মানস, পৃ. ৫৫)। কাজী আবদুল মান্নান 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'কেই মীরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলে মনে করেন (বাংলা একাডেমী পত্রিকা-২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৯)। মুহম্মদ আবদুল হাই মনে করেন—বিষাদ-সিন্ধু নয়, গাজী মিয়াঁর বস্তানীই মীরের শ্রেষ্ঠ রচনা (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা. ৮৩)।

২ 'আনোয়ারা' (১৯১৪) মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রণীত 'পারিবারিক ও সামাজিক' উপন্যাস। ১৯৬৫-তে এ-উপন্যাসের অষ্টাবিংশ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এবং এ-পর্যন্ত পুস্তকটির ২ লক্ষের অধিক কপি বিক্রয় হয়েছে।

৩ 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশের পর চুয়াল্লিশ বছরে এর বাইশটি সংস্করণ হয়। আজ পর্যন্ত মোট কয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও দীর্ঘকাল আগে ড. কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর 'আনোয়ারা' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন যে, বইটির দেড় লক্ষেরও বেশী কপি যে এ-পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় (২৮-২৯, পৃ. ৩৮) বিষাদ-সিন্ধু তৃতীয় খণ্ডের (এজিদবধ পর্ব্ব) প্রকাশকাল দিয়েছেন ১০ই মার্চ, ১৮৯১। কিন্তু পৃথক পুস্তক হিসেবে এই তৃতীয় খণ্ডের কোন খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি।

৫ তখন মশাররফ হোসেন দেলদুয়ার জমিদারীর ম্যানেজার পদে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে এ উৎসর্গ পত্রটি অনুপস্থিত। আপাততঃ এর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনিবের সঙ্গে মশাররফ হোসেনের তেমন কোন বিরোধ হয়েছিল কিনা, সঠিক জানা যায় না। তবে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে মশাররফ হোসেন এক মহিলা জমিদারের চিত্র অঙ্কণ করেছেন—যার সঙ্গে লেখকের কোন কারণে মতান্তর ঘটেছিল। অনেকের ধারণা (মুনীর চৌধুরী, 'মীর-মানস', পৃ. ১০০) গাজী মিয়াঁর বস্তানীর বেগম ঠাকুরান চরিত্রটি করিমননেসা খাতুনকেই উপলক্ষ করে সৃষ্ট।

৬ অষ্টম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "প্রতি সংস্করণেই" 'বিষাদ-সিন্ধু' উন্নত অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।" মশাররফ রচনা-সম্ভার, (কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮০, ২য় খণ্ড, পৃ. পাঁচ)।

৭ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের কারণে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত পণ্ডিত ব্যক্তি 'কুৎসিত এবং পাঠের অযোগ্য' বলে মন্তব্য করেছেন। মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করার ফলে মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর 'দুগ্ধ সরোবর' বইটি সম্পর্কে 'কোন খবরের কাগজওয়ালা হিন্দু' বিদ্রূপ করে মন্তব্য করেন, "মুসলমানের বাবুর্চিখানার গব্যদুগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য, এই জন্য আমরা এই দুগ্ধের আস্বাদ লইতে পারিলাম না।" মশাররফ রচনা-সম্ভার, ২য় খণ্ড, ভূমিকা নয়-দশ।

৮ বিষাদ-সিন্ধু প্রথম পর্ব প্রকাশের পর এ গ্রন্থের ভাষা মুসলমান-সমাজে নিন্দিত হয়েছিলো। স্বসম্প্রদায়ের শিল্প-বিমুখতায় মশাররফ হোসেন পীড়িত হয়েছিলেন। তাই আক্ষেপ করে লিখেছিলেন : "কবি-কল্পনার সীমা পর্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাঁধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে কল্পনা-কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানাদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ভগবান! সমাজের মূর্খতা দূর কর! কুসংস্কার তিমির সদ্জ্ঞান জ্যোতি-প্রতিভায় বিনাশ কর।" বিষাদ-সিন্ধু, মশাররফ রচনা-সম্ভার,

২য় খণ্ড, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, (ঢাকা, ১৯৮০), উদ্ধার পৰ্ব্ব, ৪র্থ প্রবাহ, পৃ. ২৭৪

(বর্তমান প্রবন্ধে 'বিষাদ-সিন্ধু'র পৃষ্ঠার সংখ্যা উল্লিখিত হবে এ-'রচনা সম্ভারে'র পৃষ্ঠানুসারেই।)

৯ গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

১০ সুলভ সমাচার, ১৯ শে বৈশাখ, ১২৯৩

১১ চারুবার্ত্তা, ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

১২ ভারতী, ফাল্গুন, ১২৯৩

১৩ কায়কোবাদ, 'মহরম-শরিফ', ঢাকা, ১৩৪০, ভূমিকা, পৃ. ১৪-১৫

১৪ কায়কোবাদ, 'মহরম-শরিফ', দ্বি-স. ঢাকা, ১৩৫৬, ভূমিকা, কৈফিয়ৎ অংশ, পৃ. ২

১৫ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', (কলিকাতা, ১৯৭১), পৃ. ২০৫

১৬ কাজী আবদুল ওদুদ, ''শাশ্বত বঙ্গ', (কলিকাতা, ১৩৫৮), পৃ. ১২৫

১৭ বিশ্লেষণের সুবিধের জন্যে আমরা উভয় লেখকের ভাষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি : ''এজিদের শিরায় শিরায়, শোণিত বিন্দুর প্রতি পরমাণু অংশে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, শয়নে, স্বপনে জয়নাব লাভের চিন্তা অন্তরে অবিরতভাবে রহিয়াছে। কিন্তু সে চিন্তার উপরেও আর একটি চিন্তা শুদ্ধ মস্তিষ্ক মধ্যে ঘুরিতেছে। এক সময়ে, এক মনে, দুই প্রকার চিন্তা অসম্ভব।... চিন্তার আধার মস্তক, কিন্তু ভালবাসার চিন্তাটুকু মস্তকে উদিত হইয়াই একেবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থান অধিকার করিয়া বসে। তাহা যখনই মনে উদিত হয়, অন্তরে ব্যথা লাগে, হৃদপিণ্ডে আঘাত করে, হৃদয়তন্ত্রী বেহাগ রাগে বাজিয়া উঠে।'' ('বিষাদ-সিন্ধু', মহরম পৰ্ব্ব, তৃতীয় প্রবাহ)

কিংবা—''জাএদা এক পাত্রে মধু ও অন্য পাত্রে জল আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিলেন। সকৌতুকে হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, ''অসময়ে মধু!'' মায়াপূর্ণ আঁখিতে হাসানের দিকে একবার তাকাইয়া জাএদা উত্তর করিলেন, আপনার জন্য আজ আটদিন এই মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। পান করিয়া দেখুন খুব ভাল মধু। (মহরম পৰ্ব্ব, চতুৰ্দ্দশ প্রবাহ)

লক্ষণীয় যে, মশাররফ হোসেন তাঁর সুবিধানুযায়ী একটি ভাষারূপ গড়ে নিতে পেরেছেন, এবং শব্দপ্রয়োগে স্বকীয়তা দেখানোর মত

যোগ্যতাও আয়ত্তাধীনে আনতে পেরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এর মধ্যে উঁকি মারলেও মীরের বৈশিষ্ট্যও এতে অক্ষুন্ন রয়েছে। নাটকীয়তা পরিস্ফুটনে যে ভঙ্গীর প্রয়োজন, ঘরোয়া কথা-বার্তার জন্যে যে ভাব-ভাষার আবশ্যক তা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

'বিষাদ-সিন্ধু'র পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। এ-প্রসঙ্গে অবশ্য একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মশাররফ হোসেন যখন 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনা করেন, তখন বঙ্কিম 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পরিক্রমা শেষ করেছেন। মশাররফ হোসেন নিশ্চয় বঙ্কিমের গ্রন্থাদি পড়ে থাকবেন। মীরের ভাষার নমুনা দিয়েছি, এখন বঙ্কিমের ভাষার উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "সেই দিবস অনেক রাত্রি পর্যন্ত আয়েশা ও ওসমান জগৎ সিংহের নিকট বসিয়া রহিলেন। জগৎ সিংহের কখন চেতনা হইতেছে, কখন মূর্ছা যাইতেছে; হাকিম অনেক বার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। আয়েশা অবিশ্রান্ত হইয়া কুমারের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন একজন পরিচালিকা আসিয়া আয়েশাকে কহিল যে, বেগম তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন। যাইতেছি বলিয়া আয়েশা গাত্রোত্থান করিলেন, ওসমানও গাত্রোত্থান করিলেন। আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমিও উঠিলে?' ওসমান কহিলেন, 'রাত্রি হইয়াছে, চল তোমাকে রাখিয়া আসি।" (দুর্গেশনন্দিনী)

গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি। সেই গম্ভীর নদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব, রমণী মূর্তি! কেশভার অবেনী সম্বদ্ধ, রাশিকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার, সংসর্পিত, তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। (কপালকুণ্ডলা)

এতদিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পালকিতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনে মনে বলিলেন, 'আমার এতদিনে সব ফুরাইল।' কি ফুরাইল? সুখ? তাত যেদিন সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই ফুরাইয়া ছিল। তবে এখন ফুরাইল কি? আশা। যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায়না, আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল। (বিষবৃক্ষ)

১৪ এদেশের মুসলিম পাঠক-সমাজে জনপ্রিয়তার বিচারে দুটি পুস্তক তুলনারহিত—'আনোয়ারা' এবং 'বিষাদ-সিন্ধু'। 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশের পর চুয়াল্লিশ বছরে এর বাইশটি সংস্করণ হয়। দীর্ঘকাল পরে ড. কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর 'আনোয়ারা' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ

করেছিলেম, "বইটির দেড় লক্ষেরও বেশী কপি যে এই পর্যন্ত হয়েছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।" (দ্রষ্টব্য—২ ও ৩ নং উৎস-নির্দেশ।)

১৯ 'বঙ্গদর্শন', পৌষ, ১২৮০

২০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

২১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৮

২২ মহরম পর্ব্বের ভূমিকা, 'মশাররফ রচনা-সম্ভার', পৃ. তিন

২৩ দ্রষ্টব্য, মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

২৪ রশীদ আল্ ফারুকী, 'মুসলিম-রচিত বাঙলা উপন্যাসের আদিপর্ব (১৮৬৯-১৯০০), 'দেশ'. ২৫ শে অগাস্ট, ১৯৭৯, পৃ. ৪৩

২৫ মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২৬ লেখকের মতে 'বিষাদ সিন্ধু'র ঘটনার মূল কারণ এজিদের অনিবার্য রূপতৃষ্ণা। মহরম পর্ব্ব, প্রথম প্রবাহ, পৃ. ৬

২৭ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', (৪র্থ স. চট্টগ্রাম, ১৩৮১), পৃ. ৭৫

২৮ মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

২৯ রশীদ আল্ ফারুকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৩০ মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৩১ ঐ

৩২ উদ্ধার পর্ব্ব, তৃতীয় প্রবাহ, পৃ. ২৭০

৩৩ কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৩৪ মহরম পর্ব্ব, সপ্তম প্রবাহ, পৃ. ৩৯-৪০

৩৫ 'বিবি কুলসুম', 'মশাররফ রচনা-সম্ভার', (৫ম খণ্ড), পৃ. ৫৪২-৪৩

৩৬ মায়মুনার প্রস্তাবের প্রথম অভিঘাতে শিহরিত জাএদা বলেছে: "শেষের কার্য্যটি জাএদার প্রাণ থাকিতে হইবেনা।'—মহরম পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ, পৃ. ৮৫

৩৭ 'বিষাদ-সিন্ধু', মহরম পর্ব্ব, সপ্তদশ প্রবাহ, পৃ. ১২৩

৩৮ বিষাদ-সিন্ধু, এজিদ-বধ পর্ব্ব, প্রথম প্রবাহ, পৃ. ৪৬৬-৬৭

৩৯ ঐ

৪০ 'মহরম পর্ব্বের', অষ্টাদশ প্রবাহ থেকে 'উদ্ধার পর্ব্বের' প্রথম প্রবাহ পর্যন্ত জয়নাব সম্পর্কে লেখক নীরব। দ্বিতীয় প্রবাহের বন্দিনী জয়নাব পাঠক-চিত্তে বড় বেশী দাগ কাটতে পারেনি। এর পর জয়নাবের আবির্ভাব হয় উপন্যাসের একেবারে শেষে 'এজিদ-বধ পর্ব্বের' তৃতীয় প্রবাহে।

৪১ কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৪২ ঐ

৪৩ 'আধুনিক সাহিত্য', "রাজসিংহ" প্রবন্ধ।

৪৪ যেমন : (ক) অর্থ। হায়রে অর্থ !! হায়রে পাতকি অর্থ !
তুই জগতে সকল অনর্থের মূল।
(উদ্ধার পর্ব্ব, ২য় প্রবাহ, পৃ. ২৫৬)

(খ) রে পথিক। রে পাষাণ পথিক !!
কি লোভে এত এস্তে দৌড়িতেছ ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ ?
(উদ্ধার পর্ব্ব, ২য় প্রবাহ, পৃ. ২৫৬)

৪৫ 'মহরম পর্ব্ব', চতুর্বিংশ প্রবাহ, পৃ. ১৯৯

৪৬ ঐ

৪৭ 'মহরম পর্ব্ব', ত্রয়োবিংশ প্রবাহ, পৃ. ১৬১

৪৮ 'উদ্ধার পর্ব্ব', উনবিংশ প্রবাহ, পৃ. ৪৩৪

৪৯ 'এজিদ-বধ পর্ব্ব', প্রথম প্রবাহ, পৃ. ৪৭৩

৫০ 'এজিদ-বধ পর্ব্ব, চতুর্থ প্রবাহ, পৃ. ৫০৪

৫১ 'মহরম-পর্ব্ব', পঞ্চবিংশ প্রবাহ, পৃ. ২৩০

৫২ 'এজিদ-বধ পর্ব্ব', প্রথম প্রবাহ, পৃ. ৪৬৮

৫৩ মহরম-পর্ব্ব, চতুর্থ প্রবাহ, পৃ. ২৭

৫৪ মহরম-পর্ব্ব, তৃতীয় প্রবাহ, পৃ. ২১

৫৫ মহরম-পর্ব্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ, পৃ. ৮৬

৫৬ কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৫৭ উদ্ধার-পর্ব্ব, চতুর্থ প্রবাহ।

৫৮ কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৫৯ উদ্ধার-পর্ব্ব, একবিংশ প্রবাহ, পৃ. ৩৭৩

৬০ মহরম-পর্ব্ব, ত্রয়োবিংশ প্রবাহ, পৃ. ১৫৮

৬১ মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৬২ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'কথা ও কবিতা', (ঢাকা, ১৯৮১), পৃ. ৫৬